নীল, সবুজ ও ধূসর পানির পৃথিবী

আলোর ইশারা

ড. আইনুন নিশাত

প্রতি বছরের মতো এই ৫ জুনেও বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হচ্ছে। এবারে লক্ষ্য করছি, সব অনুষ্ঠান কেবল ৫ জুন তারিখে নয়; তার আগে-পরে পাঁচ-ছয় দিন ধরে প্রসারিত হয়েছে। অর্থাৎ পরিবেশ দিবসের গুরুত্ব বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কাছে বেড়েছে। গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে ভাবছে। লক্ষণটা ভালো। কিন্তু বছরের কেবল পাঁচ-সাত দিন পরিবেশ নিয়ে ভাবলে হবে না, ভাবতে হবে সারাবছর ধরে, প্রত্যেকটি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে ঘিরে। এজন্য প্রথমেই বুঝে নেওয়া দরকার পরিবেশের সংজ্ঞা কী।

আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে তৃতীয় শ্রেণীতে যে সংজ্ঞা শেখানো হয়, সেটি আমাদের কাছে সর্বোত্তম মনে হয়। অর্থাৎ শিশুদের শেখানো হচ্ছে– আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে, তা নিয়েই আমাদের পরিবেশ। সাধারণভাবে পরিবেশ বলতে আমরা প্রাণিজগৎ, উদ্ভিদজগৎ, পশুপাখি, বনভূমি, জলাভূমি, এবং আরেকটু টেনে নিয়ে গিয়ে হয়তো বায়ু দূষণ, পানি দূষণের কথা ভাবি। এই ভাবনাকে আরেকটু বিস্তৃত করে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে দূষণ কীভাবে ঠেকানো যায়, প্রকৃতি কীভাবে সুন্দর রাখা যায়, বাতাস কী করে নির্মল রাখা যায়, তা নিয়ে ভাবতে হবে। আরেকটু যদি টেনে নিয়ে যাই, তাতে সবার খাদ্য নিরাপত্তা, বাসস্থানের নিশ্চয়তা, যথোপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা, পানি ও বিদ্যুতের সহজলভ্যতা, কর্মসংস্থানের অধিকার নিশ্চিত করাও বোঝায়। আমরা প্রায়ই স্লোগানের মতো বলি, মানুষ ভালো থাকলে পরিবেশ ভালো থাকবে, আর পরিবেশ ভালো থাকলে মানুষ ভালো থাকবে। এটা নিরেট বাস্তবতা।

এবারের পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্যের কথায় আসি– বলা হচ্ছে 'সেভেন বিলিয়ন ড্রিমস; ওয়ান প্লানেট; কনজ্যুম উইথ কেয়ার'। অর্থাৎ সাতশ' কোটি মানুষের স্বপ্ন, একটি মাত্র পৃথিবী, দায়িত্বশীলতার সঙ্গে সম্পদের ব্যবহার। অর্থাৎ ভোগবাদী সমাজের প্রতি আঙুল দেখিয়ে বলা হচ্ছে– অপচয় রোধ করো। ওয়েবসাইটে এ বিষয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে দেখলাম, আরেকটি কথা আছে। সেটি হচ্ছে, নীল পৃথিবী বা নীল অর্থনীতি। এই নীল পৃথিবী নিয়ে পানিবিজ্ঞানীদের একটি ব্যাখ্যা আছে। সেটি পাঠকের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই।

পৃথিবীতে জনসংখ্যা যখন ততটা বাড়েনি, মানুষ কেবল গৃহী হয়ে উঠছে; তখন মানুষ জীবন ধারণ করেছে প্রকৃতির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে। ফসল উৎপাদন করেছে বৃষ্টিনির্ভর হয়ে। বন-বাদাড় গড়ে উঠেছে বৃষ্টির পানি নিয়ে। সভ্যতা গড়ে উঠেছে নদীর পাড়ে। নদী থেকে জোগান দেওয়া হয়েছে খাবার পানি, যোগাযোগ ও পরিবহনের নৌপথ। কোনো বছর পানি একটু বেশি পাওয়া যায় এবং সেটা মাত্রার অতিরিক্ত হয়ে গেলে বন্যা সমস্যার সৃষ্টি করে। কোনো বছর বৃষ্টিপাত কম হলে পাশের নদী কিংবা খাল, কিংবা জলাশয় থেকে কিছু পানি জমিতে দেওয়া যেতে পারে। এ ধরনের পানিকে আমরা নীল পানি বা ব্লু ওয়াটার বলি।

মানব সভ্যতা সমৃদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিশ্বজুড়ে আয়োজন করেছি বড় বড় সেচ প্রকল্প। পানি দেওয়া হচ্ছে বৃষ্টিহীন জায়গাতে, জমির উর্বরতা থাকলে উৎপাদিত হচ্ছে বিপুল পরিমাণ ফসল। কিংবা নদীর পাড়ে বাঁধ দিয়ে বন্যার পানি ঠেকিয়ে উচ্চ ফলনশীল ফসলের আবাদ করা হচ্ছে। ওই ফসলের জন্য যতটুকু পানি প্রয়োজন, তা দেওয়া হচ্ছে নিয়ন্ত্রিতভাবে। এই পানিকে আমরা গ্রিন ওয়াটার বা সবুজ পানি বলি। প্রাকৃতিক মৎস্য উৎপাদনে নীল পানি ব্যবহৃত হয়। আর সবুজ পানি দিয়ে দিয়ে আমরা মাছ চাষাবাদ করতে পারি। আমরা প্রায়ই নীল পানিকে সবুজ পানিতে রূপান্তরিত করতে গিয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলি। অর্থাৎ উৎপাদন বাড়ে; কিন্তু পানির ব্যবহার পরিবর্তিত হয়। যে উৎস থেকে আমরা পানি তুলছি, যেমন ধরা যাক একটি নদী, সেখান থেকে আমরা অনেক সময় পুরো পানিই তুলে ফেলি। এতে করে নদীর বক্ষে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়ে কিংবা সেচের পানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু নদীর যে বারোটা বেজে গেল, সে কথা আমরা মনে রাখি না।

পানির তৃতীয় ধরনের রঙ হচ্ছে ধূসর। আমরা প্রকৃতিতে যথেচ্ছভাবে বর্জ্য নিক্ষেপ করি। তরল বর্জ্য এবং দানাদার বর্জ্য। ঢাকায় পলিথিন ফেলতে ফেলতে বুড়িগঙ্গার তলদেশ উঁচু করে ফেলেছি; শিল্পবর্জ্য ফেলে নদীর পানিকে আলকাতরার কাছাকাছি কালো রঙ দিয়ে দিয়েছি। এই নীল পানিকে সবুজ পানিতে রূপান্তরিত করার আগে কিছু চিন্তা-ভাবনা করলে প্রকৃতির গুণাগুণ হয়তো রক্ষা করা যায়; কিন্তু ধূসর পানি সামলানো অনেক জটিল কাজ। পানির ধূসর রূপান্তরের কাজ যারা করে থাকেন, তারা অনেকটা অমার্জনীয় অপরাধ করে থাকেন। অন্তত দেশের আইন তা বলে।

এবারের পরিবেশ দিবসের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়ে বলা হচ্ছে, প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষেত্রে বিশ্বের সাতশ' কোটি মানুষকে বিবেচনায় আনতে হবে। বলা হচ্ছে, প্রাকৃতিক সম্পদ অসীম নয়। অর্থাৎ যখন আমরা সম্পদ ভোগ করছি, তখন যেন যত্নের সঙ্গে হিসাব-নিকাশ করে করি।

কথাটি এসেছে আমার ধারণা, যারা বৈশ্বিক উষ্ণতার বিষয়ে চিন্তিত, তাদের কাছ থেকে। বোধহয় বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মাসখানেক ধরে জোরের সঙ্গে বলা শুরু করেছেন যে উন্নত দেশগুলোকে জীবনধারা বদলাতে হবে। আমরা বারবার বলে এসেছি, পৃথিবীর চারটি প্রধান গ্রিনহাউস গ্যাস উদ্‌গিরণকারীর মধ্যে রয়েছে যথাক্রমে চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৮টি দেশ। এর সঙ্গে জাপান কিংবা রাশিয়া বা অস্ট্রেলিয়ার নাম যোগ করা যেতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল কিংবা দক্ষিণ কোরিয়ার নামও সংযুক্ত করা যেতে পারে। আমরা লক্ষ্য করেছি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন কিংবা নরওয়ের মতো দেশ এ ব্যাপারে উদ্যোগী হলেও অন্যান্য উন্নত দেশ, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রীয়ভাবে এ ব্যাপারে কোনো অগ্রগতি দেখাচ্ছে না। বৈশ্বিক উষ্ণতার বিষয়টি ছাড়াও টেকসই উন্নয়নের বিষয়টি রয়েছে। এ বছরের শেষ নাগাদ মিলেনিয়াম ডেভেলেপমেন্ট গোল বা সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পরিমার্জনা করে আটটির পরিবর্তে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হবে। মোটামুটি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে; কেবল রাষ্ট্রপ্রধানদের চূড়ান্ত অনুমোদন বাকি। এখানেও জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টিকে জোরের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে এবং বৈশ্বিক জীবনযাত্রার ধারা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। সম্পদের অপচয়ের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে বলা হচ্ছে।

এ পর্যায়ে বাংলাদেশের মতো দেশের করণীয় কী, তা নিয়ে কথা বলা যেতে পারে। আমরা যদিও বেশিদিন দরিদ্র থাকতে চাই না। তবুও মেনে নিতে হবে যে আমরা এখনও অতিদরিদ্র দেশগুলোর অন্যতম। প্রকৃতির ওপর আমাদের নির্ভরশীলতা কোনো অবস্থাতেই কম করে দেখা যাবে না। বিদেশে অর্জিত রেমিট্যান্সের টাকা কিংবা কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং কিছু শিল্পায়ন আমাদের আশার আলো দেখাচ্ছে। কিন্তু এ কাজে কৃষির বিষয়টি কোনো অবস্থাতেই ছোট করা যাবে না। মনে রাখতে হবে, এখানে স্বল্পপরিসর জায়গায় ১৭ কোটি লোকের বসবাস। চাষের জন্য নতুন করে যোগ করা যায়, এমন জমি নেই বললেই চলে। ফলে জলাভূমি ও বনভূমি আক্রান্ত হচ্ছে। হচ্ছে দ্রুত নগরায়ন। আমরা এ বিষয়গুলো নিয়ে কেবল ভাবতে শুরু করেছি। আমাদের সংবিধানে প্রকৃতি তথা জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি ও বনভূমি রক্ষার অঙ্গীকার এসেছে মাত্র ২০১১ সালে। নদী রক্ষায় আইন হয়েছে ২০১৩ সালে। পরিবেশ সংরক্ষণের আইন হয়েছিল ১৯৯৫ সালে, যা কিছুদিন আগে পরিমার্জিত হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি, তথা দূষণ রোধের বিষয়ে সঠিক ব্যবস্থার আইনি ভিত্তি কেবল তৈরি হচ্ছে। এখন প্রয়োজন তার সঠিক বাস্তবায়নের। এ জন্য এই আইনগুলোর সুচারু প্রয়োগ প্রয়োজন। যতটুকু বনভূমি রয়েছে, তার সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে হবে। আর যেন এর পরিমাণ না কমে। একইভাবে জলাভূমিগুলো চিহ্নিত করে তা সংকুচিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। অন্যদিকে দূষণকারীদেরও আইনের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে রোধ করতে হবে।

প্রশ্ন হচ্ছে, এই জরুরি কাজগুলোর সবকিছুই কি আমরা সরকারের ওপর ছেড়ে দেব? আমার উত্তর হচ্ছে, তাহলে সরকার কোনোদিনই আইনের সঠিক প্রয়োগ করতে পারবে না। চেষ্টা করলে সম্ভব হয়। একটি উদাহরণ দিই। এখন থেকে ২০-২৫ বছর আগে যেখানে-সেখানে ধূমপায়ীরা ধূমপান করত। এখন বন্ধ হয়েছে। এখন তারা লজ্জা পায়। এর কারণ ধূমপানের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ এসেছে। একই ধরনের সামাজিক প্রতিরোধ কি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে হতে পারে না? কেন আমরা যেখানে-সেখানে বর্জ্য ফেলি? কেন পানি খেয়ে খালি প্লাস্টিকের বোতল যেখানে-সেখানে ফেলে দেই? কেন দামি গাড়িতে চড়ে যাওয়া ব্যক্তি বিস্কুট খেয়ে প্যাকেটটি জানালা দিয়ে ফেলতে দ্বিধা করেন না? মাঝরাতে বেরোলে ঢাকার রাস্তা প্লাস্টিকের বর্জ্যে ভর্তি পাওয়া যায় কেন? কেন সরকার নিয়োগকৃত পরিচ্ছন্ন কর্মীর কাজের বোঝা দিনে দিনে বাড়ছে? কেন কাঁচাবাজারের পাশ দিয়ে দুর্গন্ধের জন্য হাঁটা যায় না? এ বিষয়গুলো আমাদের ভাবতে হবে। আমরা যদি ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্বশীল হতে পারি, তাহলে শহর-নগর-বন্দর পরিষ্কার থাকবে। পরিবেশ ভালো থাকবে।

লেখাটি শেষ করি একটি বহুল উদ্ধৃত আপ্তবাক্য দিয়ে। এতে ইংরেজি ভাষার 'আর' বর্ণ তিনবার আদ্যাক্ষর হিসেবে ব্যবহার হয়েছে– রিডিউস, রিইউজ অ্যান্ড রিসাইকেল। আমরা যদি যথাসম্ভব এ তিনটি কাজ করি, তাহলে অপচয় বহুলাংশে রোধ করা সম্ভব। এই কাজে কিছুটা অগ্রগতি আমরা দেখতে পাচ্ছি। বহু অফিসে কাগজের ব্যবহার কমেছে। সরকারি দপ্তর থেকে সভার নোটিশ ই-মেইলের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে। এগুলো নিশ্চয়ই ভালো লক্ষণ। এর মানে, রিডিউস হচ্ছে। এখন এক পৃষ্ঠা ছাপা কাগজের অব্যবহৃত পৃষ্ঠা আবার ব্যবহার হচ্ছে। তার মানে, রিইউজ হচ্ছে। আমাদের এখন করতে হবে রিসাইকেল। আমরা বিভিন্ন বর্জ্য, যেমন কাগজ, কাচ কিংবা প্লাস্টিক যদি আলাদা করে নির্দিষ্ট স্থানে রাখি, তাহলে তিনটিই সহজে আলাদা করে রিসাইকেল করা যাবে। এ ধরনের কথা আমি ক্লাসে, সভায় বলে থাকি। আজকে পুনরায় বলছি, কারণ যথেষ্ট অগ্রগতি হলেও আরও এগিয়ে যেতে হবে।

পাঁচই জুন থেকে বোধহয় বৃক্ষরোপণ সপ্তাহও পালিত হতে যাচ্ছে। প্রশ্ন করি, প্রতি বছর যে গাছ লাগাই সেটা যায় কোথায়? আসলে প্রত্যেকটি কাজের মূল্যায়নের সময় এসেছে। চারা লাগিয়ে সেটা মহীরুহ পর্যন্ত বাড়িয়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে। এসব দায়িত্বশীলতা যদি আমরা ব্যক্তিগতভাবে মেনে চলি, তাহলে সাতশ' কোটি মানুষের পৃথিবী আরও সুন্দর হবে। আর প্রকৃতির সঙ্গে দায়িত্বহীন আচরণ করলে, দুর্ব্যবহার করলে প্রকৃতি বিভিন্নভাবে প্রতিশোধ নয়। যেটা আমরা দেখছি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে। উন্নয়ন প্রয়োজন, অন্যথায় মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হবে না। কিন্তু পরিবেশ রক্ষাও প্রয়োজন, অন্যথায় উন্নয়ন দীর্ঘমেয়াদে ভালো অবস্থায় থাকবে না। টেকসই হবে না। উন্নয়ন ও প্রকৃতি সংরক্ষণের মধ্যে সমন্বয়ের কাজটিই হচ্ছে সবচেয়ে জরুরি।

■ পরিবেশ বিশেষজ্ঞ; অধ্যাপক ইমেরিটাস, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়